

মেডিকেল শিক্ষায় জোড়াতালি

শিশির মোড়ল

দেশের মেডিকেল শিক্ষা কার্যক্রম জোড়াতালি দিয়ে চলছে। মূল সমস্যা শিক্ষকসংকট। সরকারি-বেসরকারি মিলিয়ে ১০৫টি মেডিকেল কলেজে এখন শিক্ষকের সংখ্যা ৯ হাজার ৪০৩। দরকার অন্তত ২৫ হাজার ৩০০ জন। অর্থাৎ ৬৩ শতাংশ শিক্ষক কম রেখেই মেডিকেল শিক্ষা দিয়ে যাচ্ছে কলেজগুলো। বিশেষজ্ঞরা এই শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তুলে বলছেন, এর ফলে নিম্নমানের চিকিৎসক তৈরি হচ্ছে।

এমন পরিস্থিতিতেও মেডিকেল কলেজের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। বর্তমান দক্ষায় ক্ষমতায় আসার পর ২০০৯ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত ৪৭টি মেডিকেল কলেজের অনুমোদন দিয়েছে আওয়ামী লীগ সরকার। পরিসংখ্যান বলছে, দুই মাসে দেশে একটি করে মেডিকেল কলেজ হচ্ছে। প্রতিটি জেলায় একটি করে সরকারি মেডিকেল কলেজ খোলার পরিকল্পনা আছে সরকারের। স্বাধীনতার পর প্রথম ২০ বছরে দেশে মেডিকেল কলেজ ছিল নয়টি (সরকারি ছয়, বেসরকারি তিনটি)। ১৯৯২ থেকে ২০০৮ পর্যন্ত ৪৯টি মেডিকেল কলেজ অনুমোদন দেওয়া হয়।

প্রথম আলোর অনুসন্ধান দেখা গেছে, অধিকাংশ মেডিকেল কলেজে ভৌত অবকাঠামো ও শিক্ষা সরঞ্জাম নেই। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো মেডিকেল কলেজ স্থাপন ও পরিচালনার নীতিমালা মানছে না। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব অনুসন্ধান ও পর্যালোচনাতোও নতুন সরকারি কলেজগুলোর দুর্বলতা ও বেসরকারি কলেজগুলোর অনিয়ম ধরা পড়েছে। যুক্তরাজ্য সরকারের আর্থিক সহায়তায় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সরকারি ও বেসরকারি মেডিকেল কলেজের পরিস্থিতি মূল্যায়ন করেছে। দুজন বিশেষজ্ঞের তৈরি 'বাংলাদেশের নতুন মেডিকেল কলেজের পরিস্থিতি মূল্যায়ন' শীর্ষক ১৩০ পৃষ্ঠার প্রতিবেদনে আর নতুন মেডিকেল কলেজ না করার সুপারিশ করা হয়েছে।

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

■ খুলনা মেডিকেল কলেজে শিক্ষকসংকট

দেশে মেডিকেল কলেজের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক নেই প্রায় কোনো কলেজেই। আছে অবকাঠামোর দুর্বলতা

মেডিকেল কলেজে শিক্ষক

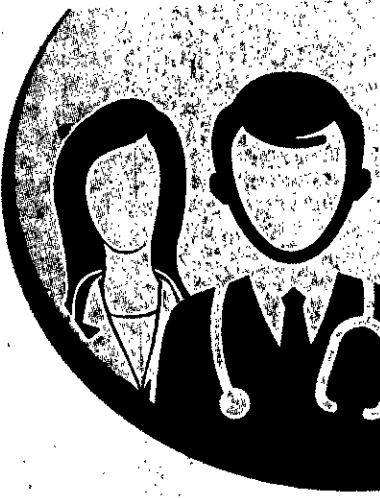
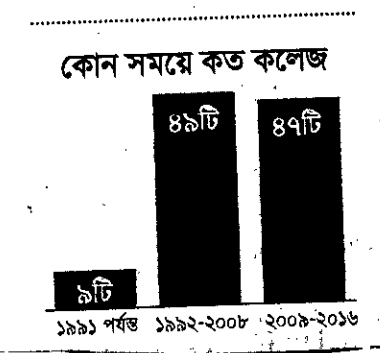
বর্তমানে ৬৩% ৩৭%
ঘাটতি রয়েছে



দেশে মেডিকেল কলেজ

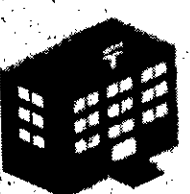
১০৫টি
সরকারি ৩৬টি ■ বেসরকারি ৬৯টি
মোট শিক্ষার্থী প্রায় ৫২ হাজার

কোন সময়ে কত কলেজ



অবকাঠামোর দুর্বলতা

কোনো কোনো কলেজে পরীক্ষা নেওয়ার জন্য সুনির্দিষ্ট কক্ষ নেই। কোনোটার মিলনায়তন নেই। প্রয়োজনীয় সংখ্যক টিউটোরিয়াল কক্ষ আছে মাত্র একটি কলেজের। অধিকাংশ মেডিকেল কলেজের গ্রন্থাগার খুবই ছোট, বইপত্রও কম



মেডিকেল শিক্ষায় জোড়াতালি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

পেশাজীবী চিকিৎসকদের সংগঠন বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের (বিএমএ) সাবেক সভাপতি অধ্যাপক মাহমুদ হাসান প্রথম আলোকে বলেন, 'স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে মেডিকেল শিক্ষাবিষয়ক প্রতিটি সভায় নীতিমালা মেনে চলার ওপর আমরা জোর দিই। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে শর্ত পূরণ না করেও কলেজগুলো অনুমোদন পাচ্ছে, বছর বছর আসন বাড়ছে।' তিনি বলেন, ২০১৪ সালে কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় বিএমএ নতুন মেডিকেল কলেজ না করার পক্ষে মত দেয়। বিএমএর মতামত মন্ত্রণালয়কে জানানো হয়। এ ব্যাপারে স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম প্রথম আলোকে বলেন, সরকারি মেডিকেল শিক্ষার প্রসার ঘটাতে চায়। নতুন মেডিকেল কলেজের অনুমোদনের ব্যাপারে কড়াকড়ি করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে শর্ত না মানা চারটি কলেজে ভর্তি বন্ধ রাখা হয়েছে। এ থেকে অনারী শিক্ষা না নিলে আরও কঠোর ব্যবস্থা, এমনকি মেডিকেল কলেজ বন্ধ করে দেওয়া হবে।

বর্তমান পরিস্থিতিতে আশঙ্কাজনক মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা হোসেন জিল্লুর রহমান স্বাস্থ্য পরিস্থিতি ও মেডিকেল শিক্ষা নিয়ে গবেষণা করছেন। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, দুর্বল অবকাঠামো ও শিক্ষকসঙ্কটের মধ্য দিয়ে নিম্নমানের চিকিৎসক তৈরি হচ্ছে। দেশে চিকিৎসাসেবার মান নিয়ে অভিযোগ আগে থেকেই আছে। বর্তমান অবস্থায় নিম্নমানের সেবা স্থায়ী রূপ পাবে।

দেশে ১০৫টি মেডিকেল কলেজের মধ্যে সরকারি ৩৬টি, আর বেসরকারি ৬৯টি। এসব কলেজে মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৫২ হাজারের কিছু বেশি।

শিক্ষকসঙ্কট
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সহায়তায় বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিল (বিএমডিস) মানসম্পন্ন মেডিকেল শিক্ষার জন্য কোন বিষয়ে কতজন শিক্ষক (অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক, প্রভাষক এবং কিছু ক্ষেত্রে নির্দেশনাকারী) থাকতে হবে, তার নির্দেশিকা তৈরি করে ২০০৯ সালে ৫০, ১০০ ও ২০০ জন শিক্ষার্থীর জন্য অ্যানাটমি, ফিজিওলজি, বায়োকেমিস্ট্রি, ফার্মাকোলজি, প্যাথলজি, ফরেনসিক মেডিসিন, কমিউনিটি মেডিসিন, সার্জারি, মাইক্রোবায়োলজি ও গাইনিতে কতজন শিক্ষক থাকবেন, তার উল্লেখ নির্দেশিকায় আছে। কোনো কলেজে ২০ বছর যদি ৫০ জন শিক্ষার্থী ভর্তি

হন, তাহলে সেখানে অন্তত ১৯৮ জন শিক্ষক দরকার। ১০০ জন হলে শিক্ষক থাকতে হবে ২৯৩ জন, আর ২০০ জন ভর্তি হলে শিক্ষক থাকতে হবে প্রায় ৪০০। ঢাকা মেডিকেল কলেজ দেশের সবচেয়ে বড় মেডিকেল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। কলেজের অধ্যক্ষ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ইসমাইল হোসেন খানের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, এই কলেজে প্রতিবছর স্নাতক পর্যায়ে (এমবিবিএস) ২১৫ শিক্ষার্থী (দেশি ১৯৭) ভর্তি হন। বিভিন্ন শিক্ষাবর্ষে মোট ১ হাজার ২০০ শিক্ষার্থী এখন কলেজে। আর শিক্ষক আছেন ৩৯০ জন। তিনি বলেন, ঢাকা মেডিকেল শিক্ষকসংকট সবচেয়ে কম। স্নাতক পর্যায়েই জন্য শিক্ষকসংখ্যা মোটামুটি ঠিক আছে। তবে এই শিক্ষক দিয়ে স্নাতকোত্তর স্তরের শিক্ষাও দেওয়া হচ্ছে।

শিক্ষক পরিস্থিতি মূল্যায়ন করে দেখা গেছে, ঢাকা মেডিকেল ছাড়া অন্য আটটি সরকারি মেডিকেল কলেজে প্রায় দুই শ শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়। কিন্তু কোনোটিতে ২৭৫ জনের বেশি শিক্ষক নেই। একটিতে আছেন ১৫৩ জন। সিরাজগঞ্জ মেডিকেল কলেজে ৫০ শিক্ষার্থীর বিপরীতে শিক্ষক মাত্র ১৮ জন।

হিসাব করে দেখা গেছে, বিএমডিসের মানদণ্ড অনুযায়ী, ৩০টি সরকারি মেডিকেল কলেজে কমপক্ষে ৮ হাজার ৩০০ শিক্ষক প্রয়োজন। এসব মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ বা দায়িত্বশীল কর্মকর্তাদের দেওয়া তথ্য যোগ করে দেখা গেছে, এসব কলেজে এখন কাজ করছেন ৩ হাজার ৪৬ জন শিক্ষক। অর্থাৎ প্রয়োজনের ৬৩ শতাংশ শিক্ষক কম আছেন। আর্মড ফোর্সেস মেডিকেল কলেজ ও পাঁচটি আর্মি মেডিকেল কলেজ এই হিসাবের বাইরে।

নতুন সরকারি মেডিকেল কলেজে শিক্ষক দিতে পারবে না সরকার। টাঙ্গাইল মেডিকেল কলেজ হয়েছে ২০১৪ সালে। কলেজের অধ্যক্ষ মোহাম্মদ আলী প্রথম আলোকে বলেন, অ্যানাটমি, ফিজিওলজি, বায়োকেমিস্ট্রি, ফার্মাকোলজি, কমিউনিটি মেডিসিন ও ফরেনসিক মেডিসিনের শিক্ষকের স্বল্পতা আছে।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের নিয়োগ করা বিশেষজ্ঞরা যশোর, সাতক্ষীরা, টাঙ্গাইল, জামালপুর, শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ (কিশোরগঞ্জ) ও শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ (গাজীপুর)—এই ছয়টি মেডিকেল কলেজের শিক্ষক পরিস্থিতি মূল্যায়ন করেছেন। তাতে দেখা যাচ্ছে, প্যাথলজি, ফরেনসিক মেডিসিন, কমিউনিটি মেডিসিন ও

মাইক্রোবায়োলজি বিষয়ে কোনো কলেজেই অধ্যাপক নেই। ছয়টি কলেজের কোনোটিতে বায়োকেমিস্ট্রি নেই। এ বিষয়ে ছয় কলেজে অধ্যাপক মাত্র একজন। সহযোগী ও সহকারী অধ্যাপকও খুব কম। অ্যানাটমির অধ্যাপক নেই তিনটি কলেজে, সহযোগী অধ্যাপক নেই চারটি কলেজে, সহকারী অধ্যাপক নেই তিনটি কলেজে। পরিস্থিতি আরও খারাপ ফিজিওলজির ক্ষেত্রে। এ বিষয়ে অধ্যাপক আছেন দুটি কলেজে, সহযোগী আছেন তিনটি কলেজে, সহকারী অধ্যাপক আছেন একটি কলেজে। ছয়টি কলেজের কোনোটিতে বায়োফিজিক্সের শিক্ষক নেই। এসব কলেজের শিক্ষার্থীরা মূলত প্রভাষকদের ওপর নির্ভরশীল।

একটি সূত্র জানিয়েছে, নতুন ১০টি মেডিকেল কলেজে শিক্ষকের পদ সৃষ্টি না করেই শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করেছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মরত চিকিৎসকদের প্রেরণে এসব কলেজে সংযুক্তি দেওয়া হয়েছে। শিক্ষকসঙ্কটের কথা স্বীকার করে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরিচালক (চিকিৎসা শিক্ষা ও স্বাস্থ্য জনশক্তি উন্নয়ন) অধ্যাপক এ এ রশিদ প্রথম আলোকে বলেন, কলেজগুলো চলছে প্রকল্পের আওতায়। এসব কলেজে শিক্ষকসঙ্কট দূর করার জন্য অধিদপ্তর ও মন্ত্রণালয় উদ্যোগ নিয়েছে। সম্প্রতি থিয়েটার নিয়ে সভাও হয়েছে।

অবকাঠামো, শিক্ষা সরঞ্জাম ও জনবলের নিশ্চয়তা ছাড়াই ঘোষণা দিয়ে একটির পর একটি কলেজ খুলছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। মূল্যায়ন প্রতিবেদন বলছে, কোনো কোনো কলেজের পরীক্ষা নেওয়ার জন্য সুনির্দিষ্ট কক্ষ নেই। কোনোটার মিলনায়তন নেই। মাত্র দুটির পর্যাপ্ত সংখ্যক লেকচার থিয়েটার দেখা গেছে। প্রয়োজনীয় সংখ্যক টিউটোরিয়াল কক্ষ আছে মাত্র একটি কলেজের। অধিকাংশ মেডিকেল কলেজের গ্রন্থাগার খুবই ছোট, বইপত্রও কম।

বিএমডিসি বলেছে, কলেজের স্বীকৃতি পেতে হলে 'মেডিকেল স্কিল সেন্টার' থাকতে হবে। এই সেন্টারে কম্পিউটার, সাধারণ মেডিকেল ল্যাব, শলাবিদ্যা চর্চার আয়োজন, মাল্টিমিডিয়া ও ফটোকপি যন্ত্র থাকতে হবে। কোনো সরকারি ও বেসরকারি মেডিকেল কলেজে এই কেন্দ্র নেই।

আছে আবাসনের সমস্যাও। বেসরকারি কলেজের নীতিমালায় বলা আছে, শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় আবাসনব্যবস্থা করবে কলেজ কর্তৃপক্ষ। তবে সরকারি কলেজের জন্য নীতিমালা

নেই। সরকারি টাঙ্গাইল মেডিকেল কলেজের ছাত্রীদের রাখা হয়েছে কর্মচারীদের কোয়ার্টারে। আর ছাত্ররা থাকেন শহরের আকুরটাকুর এলাকায়। একটি ভাড়াবাড়িতে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক সহ-উপাচার্য অধ্যাপক রশীদ-ই-মাহবুব প্রথম আলোকে বলেন, সরকার পরিকল্পনা ছাড়াই মেডিকেল কলেজ করছে। তাই শিক্ষক দিতে পারছে না। সরকারি কলেজে দুর্বলতা থাকলে সেই সুযোগটি বেসরকারি কলেজের মালিকপক্ষ ব্যবহার করে।

বেসরকারি পরিস্থিতি
মুন্সিগঞ্জ জেলার শ্রীনগর উপজেলার ধামলা গ্রামে বিক্রমপুর ভূইয়া মেডিকেল কলেজ যাত্রা শুরু করে তিন বছর আগে। আওয়ামী লীগের বিগত কেন্দ্রীয় কমিটির একজন নেতা ও তাঁর ভাইয়েরা এই কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছেন। ১৪ ডিসেম্বর ধামলা গ্রামে গিয়ে জানা যায়, গ্রামের দুজন ব্যক্তির কাছ থেকে দুটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে ছাত্রদের রাখা হচ্ছে। ছাত্রীরা থাকেন কলেজ ভবনের চারতলার ছাদে। সকাল সাড়ে আটটা পর্যন্ত কলেজে শিক্ষক চোখে পড়েনি। তৃতীয় বর্ষের একজন শিক্ষার্থী বলেন, প্রতিদিন ঢাকা থেকে শিক্ষকেরা আসেন। তাই ক্লাস শুরু হয় দেরিতে। সাড়ে নয়টার দিকে একটি অ্যাড্‌হোপ কলেজে ঢুকতে দেখা যায়। তাতে কোনো রোগী ছিল না। অধ্যক্ষসহ কয়েকজন শিক্ষকের নামতে দেখা যায়।

শ্রীনগর-দোহার সড়কের পাশে একটি চারতলা ভবনে কলেজ ও হাসপাতাল। নীতিমালা অনুযায়ী, হাসপাতাল ও কলেজ ভবন পৃথক হতে হবে। হাসপাতালের ব্যবস্থাপক এ কে এম আবদুল আলিম এই প্রতিবেদককে হাসপাতালের বিভিন্ন ওয়ার্ড দেখান। ওই দিন হাসপাতালে একজনও রোগী ভর্তি ছিল না। পরে জানা গেছে, হাসপাতালে শুধু বহির্বিভাগে রোগী দেখা হয়।

রাজধানীর ধানমন্ডির নর্দান ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ঘুরে দেখা গেছে, একটি আবাসিক ভবনের ছোট ছোট কক্ষে ক্লাস করেন শিক্ষার্থীরা।

শরীয়তপুরের মনোয়ারা সিকদার মেডিকেল কলেজের ছাত্রীরা থাকেন হাসপাতালের তৃতীয় তলায়। অধ্যক্ষসহ কলেজে শিক্ষক মাত্র ১০ জন। এদের হাসপাতাল নেই। ঢাকার বারুয়া এলাকায় আশিয়ান মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ২০১৩ সালে। কলেজ-সংলগ্ন একটি হাসপাতাল থাকলেও সেটি টিনের ছাউনি দেওয়া একতলা ভবনে।

হাসপাতালের অভাববিভাগে ভর্তি থাকা রোগীর হিসাবে দেখা যায়, ১৪ ডিসেম্বর ২১ জন ভর্তি ছিল।

রাজধানীর গুলশান ২-এর একটি গলির মধ্যে শাহাবউদ্দিন মেডিকেল কলেজ চলছে ২০০৩ সাল থেকে। কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক জাফরউল্লাহ হাসপাতালে ভর্তি থাকা রোগীর তথ্য না দিয়ে প্রথম আলোকে বলেন, হলি আর্টিজানে সস্তাসী হামলার (১ জুলাইয়ের ঘটনা) পর হাসপাতালে রোগী আসা কমে গেছে।

১৫ ডিসেম্বর শরীয়তপুরের মনোয়ারা সিকদার মেডিকেল কলেজ ঘুরে এসে প্রথম আলোর প্রতিনিধি জানান, কলেজের একটি হাসপাতাল আছে ঠিকই, তবে কোনো রোগী ভর্তি থাকে না।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের মূল্যায়ন প্রতিবেদনে সাতটি বেসরকারি মেডিকেল কলেজ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য দেওয়া হয়েছে। তাতে বলা আছে, এসব কলেজের শিক্ষার্থীদের হাসপাতালে হাতকলমে শেখার সুযোগ খুবই সীমিত। চারটি কলেজের শিক্ষার্থীর তুলনায় হাসপাতালে শয্যাসংখ্যা কম। শিক্ষার্থীরা মানসম্পন্ন শিক্ষা না পেয়েই চিকিৎসক হচ্ছেন।

অধ্যাপক মাহমুদ হাসান বলেন, অধিকাংশ বেসরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে জরুরি বিভাগ নেই। আঘাত বা দুর্ঘটনার রোগী এসব হাসপাতালে আসে না। এ ধরনের রোগীর চিকিৎসা ও ব্যবস্থাপনা শিক্ষার্থীরা শিখতে পারছেন না।

বেসরকারি কলেজেও শিক্ষকসংকট
৬৯টি বেসরকারি মেডিকেল কলেজের মধ্যে ৬২টি কলেজে কতজন শিক্ষক আছেন, তার হিসাব দিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর। বাকি সাতটি কলেজের কাছে তথ্য চেয়েও পায়নি অধিদপ্তর। অধিদপ্তরের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ৬২ কলেজে শিক্ষক আছেন ৬ হাজার ৩৫৭ জন। আর বিএমডিসের মানদণ্ড অনুযায়ী, এসব কলেজে অন্তত ১৭ হাজার ৫০০ শিক্ষক প্রয়োজন। অর্থাৎ বেসরকারি খাতও চলছে ৬৩ শতাংশ শিক্ষকের কমতি নিয়ে।

অনুমোদন পাওয়ার জন্য বেসরকারি মেডিকেল কলেজগুলো স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের শিক্ষকদের তালিকা দেয়। চারটি মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ প্রথম আলোকে শিক্ষকের তালিকা দিয়ে বলেছেন, তাঁদের শিক্ষকের স্বল্পতা নেই। 'টিচিং স্টাফ' খুবই ভালো। অন্যদিকে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের ওই মূল্যায়ন প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, একটি কলেজেও ফিজিক্যাল মেডিসিন ও ক্যান্সারবিদ্যা বিভাগে শিক্ষক নেই। কোনো কোনো

কলেজে ফিজিয়াট্রি, ফরেনসিক মেডিসিন, কমিউনিটি মেডিসিন, ডার্মাটোলজি, ব্রাড ব্যাংক, পেডিয়াট্রিক সার্জারি এমনকি মেডিসিন বিভাগে একজন শিক্ষকও নেই।

কে শিক্ষা দেবেন, কোথা থেকে শিক্ষক আসবেন—এ বিষয়গুলোর সমাধান না করেই শিক্ষার্থীদের ক্লাসে ঢোকানো হচ্ছে। অধ্যাপক মাহমুদ হাসান বলেন, 'প্রতি ১০ জন শিক্ষার্থীর জন্য একজন শিক্ষক দরকার। ধরে নিই, দেশের ১০০টি মেডিকেল কলেজে ৫০ জন করে শিক্ষার্থী ভর্তি হচ্ছে। সেই হিসাবে প্রতিবছর ৫ হাজার শিক্ষার্থী ভর্তি হচ্ছেন, আর শিক্ষক দরকার ৫০০। দেশে ১৫০ জনও অ্যানাটমির শিক্ষক নেই।'

সরকার কী করছে
সম্প্রতি একাধিক সভায় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম বলেছেন, নানা সময়ে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে মেডিকেল কলেজের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। তবে সরকার মেডিকেল শিক্ষার মান নিয়ে ছাড় দেবে না। মানসম্পন্ন থাকায় সরকার চারটি মেডিকেল কলেজে চলতি শিক্ষাবর্ষে ভর্তি বন্ধ রেখেছে। কলেজগুলো হলো নর্দান মেডিকেল কলেজ (রংপুর), সিটি মেডিকেল কলেজ (গাজীপুর), নাইটিঙ্গেল মেডিকেল কলেজ (আওলিয়া) এবং আশিয়ান মেডিকেল কলেজ (খিলক্ষেত)।